ভালবাসা কারে কয়

লেখকঃ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
যোগাযোগঃ subho_2309@yahoo.co.in
পরিচিতিঃ কর্মসূত্রে কলকাতা নিবাসী শুভেন্দু পছন্দ করেন বই পড়া আর লেখালেখি।

এক হাত দিয়ে পেটটা খামচে বসে পড়তে পড়তে আপ্রান চেষ্টা করছিল বন্যা মোবাইল ফোনটা তুলে নেবার। হাত একটু বাড়ালেই পাওয়া যাবে। টেবিলের একপাশে কোঁচকান ট্যাবলেটের খোসা, জলের গ্লাস আর তার পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে ফোনটা। ওই ফোনটার ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। অথচ হাত কিছুতেই পৌঁছচ্ছেনা, হাতড়াচ্ছে সমস্ত টেবিলময়, সাঁতার দিচ্ছে পেনের খাপ, পেনসিলের টুকরো, একটা পুরনো বিল! চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে, টেবিলের পায়া ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিচ্ছে এখন বন্যা। কিসে যেন একটা ঠোক্কর খেয়ে হাতটা আরও দূরে সরে গেল আর সেই সাথে ফোনটার ছবি। এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার; হাত নাড়াচ্ছে টেবিলের উপর। অথবা জলে। ঘন কালো জলে দুটো হাত মাথার দুদিক থেকে নেমে আসছে, দুফাঁক করে সরিয়ে দিচ্ছে জল; আর তার দুটো পা যেন কোন জলকন্যার মত – কোমরের নিচ থেকে আঁশ। বন্যাকে জড়িয়ে ধরছে। এক অনায়াস আরামের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে কোমরের নীচ থেকে একবার ঝাঁকানোর চেষ্টা করল যেন জলের উপর একবার মাথা তুলে 'ফাইট বন্যা ফাইট' পেটের হারিয়ে যাওয়া ব্যথাটাকে আরেকবার যেন অনেক কষ্টে জাগিয়ে – আর তখনি উঠে এল ফোনটা – 'আমি অরণ্য'। মাথাটা কি টেবিলের কোণায় ঠুকে গেলো! একটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ – জলের অনেক নিচে একটা আশ্চর্য পাহাড় আর তাকে ঘিরে বন্যা সাঁতার কাটছে। তার কুঁচকানো মুখের চামড়া আবার টান হয়ে গেছে, গলায় প্রবালের মালা, দুই বুক করুণ শঙ্খের মত শুভ্র আর উন্নত, সুগঠিত নিতম্ব, রূপোলি আঁশ গোপন করেছে তার লজ্জা। কতদিন কেউ চুম্বন করেনি বন্যাকে। কতদিন বন্যা কারো বুকে মাথা রেখে ঘুমায়নি। ঘুম থেকে উঠে কতদিন খুব ক্লান্ত লেগেছে বন্যার। যেন কতদিন ঘুমায়নি। ওয়ান রুম ফ্ল্যাটের একঘর থেকে বেরিয়ে কতদিন বারান্দায় মনে হয়েছে পৃথিবীটা ফুরিয়ে আসছে, উঁচু ফ্ল্যাটের পেছনে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যের মত।

শনিবার করে ফোন আসে সঞ্জুর, খুব সকালে। ওদের ওখানে তখন রাত। কেমন আছিস, ভাল, তারপর আর কথা খুজে পায়না বন্যা, অথচ সারা সপ্তাহ কত কথা জমিয়ে রাখে। কত ঝগড়া করে। 'এই জায়গাটা ময়লা করলি – জানিস সঞ্জু ময়লা দেখতে পারে না।' 'আজ ডিম রাঁধব নারকেল দুধ দিয়ে। সঞ্জু খুব ভালবাসে।' 'ওবাড়ির মেয়েটা এসেছে, বাচ্চা হবে বোধ হয়।' 'না এটা সঞ্জুকে বলা যাবে না। সঞ্জু ভালবাসত মেয়েটাকে, ছেলেটা কষ্ট পাবে।' ঘরের ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবে 'দেশের বাড়িটা তালা দেওয়া পড়ে আছে – এবার সঞ্জুকে বলতে হবে, ধুর, আমি ওবাড়িই চলে যাই।' কাজের মেয়েটা বলে মাসিমা কি বকবক করেন বলুনতো, বন্যা জানে ওরা আড়ালে হাসে, এ পাড়ায় তার নাম পাগলি দিদিমণি। রান্নাঘরে ঢুকে মনে পড়ে যায় সঞ্জু এখানে নেই, ডিম নারকেল কোরা পড়ে থাকে। সমস্ত শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসে। একগ্লাস জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেলের দিকে বেশ শীত শীত করে। হেমন্তের শেষ। এখন নাকি আর হেমন্ত কাল আসেনা। জীবনানন্দের কবিতার বইটা ওল্টাতে থাকে। আজকাল কোন উপন্যাস পড়েনা, যদি শেষ করার আগে মারা যায়! তাহলে তো আর শেষটা জানতেই পারবে না। বড় বেশী হেমন্তের কথা লিখেছেন জীবনানন্দ, "ধান কাটা হয়ে গেছে"। রাতে বিছানায় শুয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে মুখে, সত্যি ধান কাটা হয়ে গেছে। হেমন্তের রাতের শিশির এসে পড়ছে গায়ে মাথায়, সকালে মাথা ভার হবে তবু জানলাটা দিতে উঠতে ইচ্ছা করে না। ধান কাটা হয়ে গেছে – ফাঁকা মাঠ, পেঁচা আর ইঁদুরের সাথে চাঁদ, উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি গুলোর মাথায় এসে বসে। দূরে ডিস্ক অ্যান্টেনার গায়ে আটকে থাকে রাত, শুকতারা। সঞ্জুটাও কত দূরে চলে গেছে। ওর

আকাশে অন্য তারা। এক এক সময় মনে হয় সে আর সঞ্জু যেন পরস্পর বিপরীত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বয়সের পরে ছেলে যেন মার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, নইলে কেন সে বুঝতে পারেনি ছেলেটা এত কষ্ট নিয়ে আছে। যদিও কত কিছুইতো সে বোঝেনি। এই যে সে নিজে এত একা সেটা কি সে আগে বুঝেছিল? সঞ্জু এসে যখন চিলিতে চাকরি করতে যাবার কথা বলল বন্যা বিঃশ্বাস করেনি, ঠাট্টা করেছিল "ওরে ও তো উল্টো পিঠ রে পৃথিবীর, পড়ে যাবি তো?" ছেলেটা একদিন চলে গেলো আর এই এক কামরা ঘরে হেমন্তের ধান কাটা মাঠ। মেয়েটাকে আগে কখন ভাল করে দেখেনি বন্যা। পাশের বাড়িতে থাকে, একটু কালই বলা চলে। দাঁতটাও উচু মত, এই মেয়েটা তার সঞ্জুকে ব্যাথা দিয়েছে! সঞ্জুর উপর খুব রাগ হয়। ভীষণ স্বার্থপর মনে হয় ছেলেটাকে, কিভাবে মাকে একলা রেখে চলে গেল। এভাবে দূরে গেলে কি ভুলে থাকা যায়? একটা জীবন কি এভাবে কাটানো যায়। মেয়েটাকে একদিন বাড়িতে ডাকে, "এস মা কেমন আছ? কত বড় হয়ে গেছ।" মেয়েটাকে বসিয়ে মনে হয় যেন সঞ্জুর সাথে কথা বলছে।

"মা অরণ্য কে?" "অরণ্য"! চমকানোর কথা না বন্যার, তবু চমকালো। নামটা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই জলপরী। জ্ঞান হবার পর প্রথম ওই নামটাই মনে পড়েছিল। মাথার ভিতর হাতড়ে হাতড়ে কিছুতেই তুলে আনতে পারছেনা, অরণ্য নামটা তার জীবনে কিভাবে জড়িয়ে আছে? জীবনের কোন বাঁকে অরণ্য এসেছিল? অথচ সেই কণ্ঠস্বর যেন খুব পরিচিত। যতই ভাবছে মাথায় ভেসে আসছে খুব আবছা শ্যাওলা ঢাকা একটা ঘাট, বটের ঝুরি নেমে গেছে জলের ভেতর। আর সেই ঝুরি ধরে দোল দিয়ে দিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। জলের ঝাপটা এসে ছিটকে লাগছে বন্যার মুখে। ভারি মিষ্টি লাগে, জলে হালকা শ্যাওলার গন্ধ। সিড়ি দিয়ে নেমে আসে, পায়ের পাতার নিচে কি যেন সরসর সরে যায়। ভীষণ ভয় পেয়ে অরণ্যকে জড়িয়ে ধরে বন্যা। অরণ্যের সুঠাম বুকের ভিতর মুখ গুঁজে... "না তুমি অজ্ঞান অবস্থায় বারবার অরণ্যের নাম করছিলে। ডাক্তারবাবু ভেবেছেন আমার বাবা, আমি তো ওই নামে কাউকে চিনিনা, আর সেরম কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা করব"। এবার বেশ অস্বস্তি লাগে বন্যার, সঞ্জু নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু ভাবছে। অলোক কে ছেড়ে আসা নিয়ে সঞ্জু কখনো কোন প্রশ্ন করেনি। ছেলেটা খুব চাপা, তা নইলে মেয়েটা কি না কি বলল আর একবারে পৃথিবীর উল্টো পিঠে চলে যেতে হবে! "না কই জানিনা তো! অরণ্য বলে কাউকে ত চিনি না। নামটা প্রথম শুনছি" – এই প্রথম ছেলের কাছে মিথ্যা বলল বন্যা। এত গুলো কথা বলার দরকার ছিল না। অথচ দরকার যে ছিল না সেটা বলার পর-ই বুঝতে পারলো। সঞ্জু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে মা মিথ্যা বলছে। বন্যা জানে সঞ্জু আর এটা নিয়ে একটাও কথা বলবেনা, অথচ বন্যার এখন সব কথা সঞ্জুকে বলতে ইচ্ছা করছে, কেন যে মিথ্যা বলতে গেল। সে তো কোন অন্যায় করেনি। অরণ্যকে সে সত্যিই চেনে না। সঞ্জু এখন মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন সে-ই মিথ্যা কথাটা বলে আর মার দিকে তাকাতে পারছে না। বন্যা জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। কাচের ভিতর দিয়ে বুঝতে পারেনা বাইরে কতটা রোদ। একটু শীত শীত করতে শুরু করে, জ্বর আসবে বোধহয়। জ্বর এলেই আবার সে আসবে, ভীষণ লজ্জা করে বন্যার। কিছুতেই তার মুখটা দেখা যায় না, অথচ কত আপনার জন যেন। "তুমি অরণ্য? আমাকে চেন তুমি, আমিও কি তোমাকে চিনি? এভাবে তুমি হাসপাতালে এস না, সবার সামনে আমার লজ্জা করে। ছেলে রয়েছে, কি ভাববে বলত। আমাদের কি আর বয়স আছে।" কিন্তু সে এলেই বন্যার বয়েস কমে যায়। অরণ্য মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে, চামচে করে খাবার তুলে দেয় মুখে, ভীষণ কাঁপতে থাকে বন্যা। অরণ্য তোয়ালে দিয়ে হাল্কা করে মুখ মুছিয়ে দেয়। অরণ্যের হাতটা খামচে ধরে বন্যা, "জানো অলোক আমাকে ভালবাসে না, ও সঞ্জুকে মেনে নেয়নি।" হাতটা সরায় না অরণ্য বরং মুখটাকে কোলের উপর তুলে নেয়, ভীষণ নিশ্চিন্ত লাগে, অলোকের কথা ভীষণ মনে পড়ে। অথচ এখন অরণ্য এসেছে! "অরণ্য আমার খুব ঘুম পাচ্ছে যে..."। আধখাওয়া খাবারের ট্রলিটা সরিয়ে দিয়েছে এখন বিছানাটা নামিয়ে দিচ্ছে অরণ্য, হাসপাতালের ছাদটা বৃত্তাকার মুখের উপর উঠে আসতে আসতে অরণ্যের মুখটা দেখার চেষ্টা করে। যেন এই পৃথিবীতে অরণ্যের মুখ ছাড়া আর কিছু নেই, যেন এই অরণ্যের মুখ ডুবে যাচ্ছে বিছানার উল্টো দিকে আর বন্যার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ধান কাটা হয়ে গেছে, হেমন্তের মাঠে চাঁদ এসে দাঁড়ায় একা।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জু। পেটের ভেতর টিউমারে সেপটিক হয়ে গেছিল, ওই অবস্থায় দরজা খুলে যে কি করে নিচে নেমে এসেছিল, কে যে মাকে হাসপাতাল অব্দি নিয়ে এল, ভাগ্যিস সে আসার ঠিক আগের দিনই হয়েছে, নইলে কি যে হত। বাঁহাতটা চুলের ভেতর দিয়ে হাল্কা চালিয়ে নেয় সঞ্জু, গালে হাত দিয়ে বুঝতে পারে বেশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠেছে, এরই মধ্যে কয়েকটায় পাক ধরেছে। ভাবছে সেলুনে গিয়ে কেটে এলে হয়, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এসে থেকে একটু ঘুমোনোর সময় হয়নি। মার আবার জ্বর এল। এবার বোধ হয় সঞ্জু একদম একা হয়ে যাবে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে সঞ্জু। বাইরে আজ রোদটা সত্যি ঝিমিয়ে আছে, গত কাল খুব বৃষ্টি হয়েছে, এখন বাতাস বেশ ঠান্ডা। খুব জানতে ইচ্ছা করে মা কেন বাবাকে ছেড়ে এল। মার সাথে বাবার কি বনিবনা ছিল না? অথচ মার কাছে বাবার সম্বন্ধে একটাও খারাপ কথা কখন শোনেনি। বাবা মারা যাবার আগে সঞ্জুকে নিয়ে মা গেছিল দাদুদের বাড়ি। শেষ কদিন মা ওখানেই ছিল, বাবার কাছে। বাবা মারা যাবার পর চলে এসেছিল, কাছা নেয়নি, বাবার কাজ-ও করেনি। মা চায়নি। মা চায়নি এটাই শেষ কথা ছিল। মার বাইরে যে একটা পৃথিবী থাকতে পারে সেটা বুনি প্রথম বুঝিয়েছিল। বুনি সঞ্জুকে আরো একটা পৃথিবী চিনিয়েছে। মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙ্গে সত্যি সত্যি মনে হয় সে যেন অন্য এক গ্রহে বাস করছে। বহুদিন আগে লেখা রমা ঘোষের একটা কবিতা মনে পড়ে যায়। বুকের ভিতর থেকে সমস্ত খনিজ শুষে নিয়ে গেছ, তপ্ত গ্রহ। এই আকাশ সঞ্জু চেনেনা, এই তারা দেখে সঞ্জু বড় হয়নি, এই তারায় তার পূর্বপুরুষ নেই, তার বাবা নেই। যেরকম শিশুকাল থেকে, এও এক অদ্ভুত অভ্যাস। প্রতিবার নিজের পরিচয় শুরু করতেই একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, প্রসঙ্গ পালটে যায়। দরজা খুলতেই সমস্ত রক্ত লাফিয়ে উঠল মুখের উপর। “আরে সঞ্জুদা তুমি! আমি তো ভাবতেই পারিনি, মাসিমা কেমন আছেন?” মেয়েরা কি সত্যিই এতটা গোপন করতে পারে! নাকি এই মুহুর্তে সঞ্জুর বুনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা নেহাতই আরেকটা ঘটনা মাত্র। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সঞ্জু বুঝতে পারে তার খুব তেষ্টা পেয়েছে, সেই সাথে বেশ ক্ষিদে। এতক্ষণ উত্তেজনায় সে কেবল হেঁটেছে। খুব ইচ্ছা হয় বুনির কাছে একটু খাবার চায়। “তোমার শরীরটা কিন্তু বেশ খারাপ হয়েছে”। কথাটা শোনা মাত্র রাগ হয়। “কই না, একটু ওজন কমিয়েছি, মাঝে বড্ড বেড়ে গেছল, তুমি কিন্তু বেশ মুটিয়েছ।” কথাটা রাগাবার জন্য বললেও বুনি রাগলো না বরং মুখ টিপে হাসতে লাগল। যেন খুব লজ্জা পেয়েছে এভাবে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিল “এসময় হয়, পরে ঠিক হয়ে যাবে।” “তোমার বর কি করেন?” বুনি অনেক কিছু বলে চলেছে। সঞ্জুর খুব জানতে ইচ্ছে করে কত মাস, বেশ বড় হয়েছে পেটটা। হাতটা তুলে আলতো পেটের উপর রাখে। অনুভব করতে চেষ্টা করে পেটের ভেতর ওর নড়া চড়া। বুনি চমকে ওঠে কিন্তু হাত সরায় না। খুব দূর থেকে যেন বলে ওঠে “আমার বর খুব ভাল হয়েছে সঞ্জুদা।” সঞ্জুর হাতটা বুনির পেটের ভিতর আটকে থাকে, সারা শরীর দিয়ে প্রাণপণ হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করে। “তুমি বসো, খেয়ে যাও, আমি মাকে তোমার চাল নিতে বলে আসছি।” ভূতে পাওয়া মানুষের মত রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সঞ্জু। কানের মধ্যে মার কথা গুলো ভাসতে থাকে, “অলোক সঞ্জুকে মেনে নেয়নি।” বুনির মুখটা দুপুরের রাস্তায় যেন বন্যার মুখের মত ভীষণ ক্লান্ত। বুনির হাঁপাতে থাকা শ্বাসের মধ্যে এতদূরে থেকেও কেবল তারই কথা ভেবে গেছে। বুনির পেটের ভেতরে যে অদ্ভুত জিনিসটা নড়াচড়া করছে সে কি সঞ্জু নিজে? হাতের উপর মায়ের বসে যাওয়া নখের দাগের চারদিকে বিন্দু বিন্দু রক্ত জমে আছে। বিয়ের আগের দিন রাতে বুনি সারা গায়ে নখ দিয়ে হাঁচড়ে দিয়েছিল আর ঠিক এরকম রক্তের দাগ ফুটে উঠেছিল। বৃষ্টির হাল্কা ছাঁট এসে লাগছে মুখে। পালাতে হবে। দ্রুত।

বিছানায় মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, বন্যা এখন ঘুমাচ্ছে। ঘুমোলে মানুষকে বড় মিষ্টি লাগে। অলোককেও কি লেগেছিল? চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছিল বন্যা, চন্দনের এক একটা ফোঁটা যেন তাদের না করা সংসারের বিশটা বছর। ভীষণ মিষ্টি লাগছিল সেদিন বন্যাকে, নিজেকেও কি লাগছিল? কে বলবে? ছেলেটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সে কাঁদবে কিনা, কাঁদলে কার জন্য কি বলে কাঁদবে। সেরিব্রাল অ্যাটাকে কথা বন্ধ হয়ে গেছিল, বার বার ডাকতে ইচ্ছা করছিলো বন্যাকে, সঞ্জুকে, অনেক অনেক কথা...

বন্যার শরীর থেকে জ্বরের ভাপ উঠছে। যেন বিয়ের প্রথম রাতের মতন সুন্দরী হয়েছে বন্যা। ধীরে ধীরে এই তাপ শুষে নেবে পৃথিবী তখন নির্ভয়ে বন্যার পায়ের কাছে গিয়ে বসবে। এখন ওখানে বসে আছে সঞ্জু, আরো আরো অনেকদিন পরে তিনজনে একসাথে বেড়াতে যাবে। ভীষণ হাসবে বন্যা, উফ্ অলোক তুমি যা ঠকাতে পারো... আমি কিন্তু তখনি সন্দেহ করেছিলাম...